بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ মে, ২০২১ মোতাবেক ২১ হিজরত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। তিনি যেসব যুদ্ধ এবং সারিয়া বা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন– সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করছি। হযরত উমর বিন খাত্তাব বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু সারিয়া বা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন, যার মাঝে কিছু অভিযানে তিনি নেতৃত্বও দিয়েছেন। বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় সাহাবীদের কাছে থাকা উটের সংখ্যা ছিল ৭০। তাই একেকটি উটকে তিন জনের জন্য নির্ধারণ করা হয় আর প্রত্যেকে পালাক্রমে আরোহন করত। হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) একটি উটে পালাক্রমে আরোহন করতেন। বদরের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) যখন যাত্রা করেন, সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহনবী (সা.) আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে থামানোর উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হন, যা সিরিয়া থেকে আসছিল। মুসলমানদের কাফেলা যখন 'যাফেরান' পৌঁছায়, (এটি মদিনার নিকটেই সাফরা উপত্যকার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা,) তখন তিনি (সা.) সংবাদ পান যে, কুরায়েশরা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষার জন্য বের হয়েছে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন আর তাদেরকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, মক্কা থেকে একটি সেনাদল অত্যন্ত দ্রুত বেগে যাত্রা করেছে– এ সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তোমরা কী সেনাদলের বিপরীতে বাণিজ্যিক কাফেলাকে অধিক পছন্দ কর? তারা বলল, হ্যাঁ। অর্থাৎ এক দল বলে, আমরা শত্রুদের বিপরীতে বাণিজ্যিক কাফেলাকে অধিক পছন্দ করব। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক দল বলে, যদি আপনি আমাদের কাছে যুদ্ধের উল্লেখ করতেন তাহলে আমরা তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারতাম, আমরা তো বাণিজ্যিক কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার বাণিজ্যিক কাফেলার দিকেই যাওয়া উচিত আর আপনি শত্রুদের ছেড়ে দিন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। হযরত আবু আইয়ূব বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অবতরণের কারণও উক্ত ঘটনা যে,

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (সূরা আনফাল: ০৬)

অর্থাৎ, যেভাবে তোমার প্রভু তোমাকে সত্যসহ নিজ ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ মু'মিনদের একটি দল নিশ্চিতভাবে তা অপছন্দ করত। তখন হযরত আবু বকর দণ্ডায়মান হন এবং কথা বলেন আর খুব সুন্দর বক্তৃতা করেন। এরপর হযরত উমর দণ্ডায়মান হন এবং কথা বলেন আর খুব সুন্দর বক্তৃতা করেন। অতঃপর মিক্বদাদ দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেদিকেই চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। খোদার কসম, আমরা আপনাকে এ কথা বলব না যেমনটি বনী ইসরাঈল জাতি মূসাকে বলেছিল যে, فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (সূরা মায়েদা: ২৫)। অর্থাৎ তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে লড়াই কর, আমরা তো এখানেই বসে থাকব। তারা বলেন, না, বরং আমরা আপনার সহযোদ্ধা হয়ে লড়াই করব, যতক্ষণ আমাদের মাঝে প্রাণ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, তারা যখন বন্দিদের ধরেন, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন বন্দিদের ধরে, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে বলেন, এই বন্দিদের সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র নবী! তারা আমাদের চাচাতো (ভাই) এবং আত্মীয়-স্বজন। আমার মতে আপনি তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করুন, তা আমাদের জন্য সেসব কাফিরের মোকাবিলায় শক্তির কারণ হবে আর অচিরেই (হয়ত) আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ইসলামের পানে পরিচালিত করবেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার অভিমত কী? হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! না; আল্লাহ্‌র কসম, আবু বকরের সাথে আমি একমত নই। বরং আমার মত হলো, আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা তাদের শিরোচ্ছেদ করব। আলী (রা.)-এর হাতে আকীলকে তুলে দিন যাতে সে তার শিরোচ্ছেদ করে আর আমার হাতে অমুককে দিন {যে বংশের দিক থেকে হযরত উমর (রা.)-এর আত্মীয় ছিল} যাতে আমি তার শিরোচ্ছেদ করি, কেননা এরা সবাই কাফিরদের নেতা এবং তাদের সর্দার। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার মতামতকে গ্রহণ করেন নি। পরের দিন আমি এসে দেখি, মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.) বসে কাঁদছেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে বলুন কোন জিনিস আপনাকে এবং আপনার সাথিকে কাঁদিয়েছে? (আপনার কথা শুনে) আমার কান্না পেলে আমিও কাঁদব, নতুবা আমি আপনাদের উভয়ের মতো কান্নার ভান করব। মহানবী (সা.) বলেন, আমার কান্নার কারণ হলো, তোমার সঙ্গীরা আমার সামনে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের যে পরামর্শ দিয়েছিল আমার কাছে তাদের শাস্তি ঐ বৃক্ষের চেয়েও বেশি নিকটে (বলে) উপস্থাপন করা হয়েছে যে বৃক্ষটি আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর নিকটেই ছিল। আর আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ (সূরা আল্ আনফাল: ৬৮) অর্থাৎ, **কোন নবীর জন্য এটি সমীচীন নয় যে, পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াই সে কাউকে বন্দি বানাবে**। এরপর দু'টি আয়াত পরেই যা আছে তা হলো, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (সূরা আল্ আনফাল: ৭০) **অর্থাৎ, অতএব তোমরা গনিমতের মালস্বরূপ যা কিছু পাও তা থেকে হালাল ও উপাদেয় বস্তু খাও**। অতএব, আল্লাহ্ তাদের জন্য গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। এটি সহীহ্ মুসলিমের হাদীস।

এই হাদীসের প্রথমদিকের বাক্যাবলী হলো, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদছিলেন। এরপর কুরআনের আয়াতের বাক্যাবলীতে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা এই রেওয়ায়েত বা হাদীসকে সন্দেহপূর্ণ বা দুর্বোধ্য করে দেয়, অর্থাৎ স্পষ্ট করে না এবং বক্তব্য স্পষ্ট হয় না। যাহোক, এই বর্ণনাকে সঠিক জ্ঞান করে অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে ও জীবনীগ্রন্থে মুফাস্‌সিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে আল্লাহ্ তা'লা যেন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আর হযরত উমর (রা.)-এর মতামতকে পছন্দ করেছেন। হযরত উমর (রা.)-এর জীবনচরিত প্রণেতারা যখন একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শের প্রেক্ষিতে কুরআনের কোন্ কোন্ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে– সেগুলোর মধ্যে এটিও একটি লিপিবদ্ধ করা হয় যে, বদরের যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর মতামতকে আল্লাহ্ তা'লা অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। কিন্তু এটি অস্পষ্ট বা সংশয়পূর্ণ। যেমনটি আমি বলেছি, এর মাধ্যমে (বিষয়টি) স্পষ্ট হয় না, বরং মনে হয়, জীবনীকারগণ ও তফসীরকারকগণ এটি বুঝতে ভুল করেছেন। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর একটি অপ্রকাশিত তফসীরি নোট থেকে পাওয়া গেছে, যা এসব বর্ণনাকে অপনোদন করে আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-

এর ব্যাখ্যাই যথার্থ মনে হয়। মনে হয়, অকারণে হযরত উমর (রা.)-এর পদমর্যাদা উঁচু করার জন্য তারা এই রেওয়ায়েত রচনা করেছে অথবা একে ভুল বুঝা হয়েছে। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা আনফালের ৬৮ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামের পূর্বে আরবে রীতি ছিল আর তিনি লিখেন, পরিতাপের বিষয় হলো, আজও পৃথিবীর কোন কোন অংশে এই (রীতি) প্রচলিত রয়েছে যে, যুদ্ধ বা লড়াই না হলেও মানুষকে বন্দি করা হতো আর তাদেরকে দাস বানানো হতো। এই আয়াত সেই মন্দ প্রথাকে রহিত করে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করে যে, শুধুমাত্র যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের পরেই শত্রু পক্ষের লোকদের বন্দি করা যেতে পারে। যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয় তাহলে কাউকে বন্দি করা বৈধ নয়। এই আয়াতের বড়ই ভুল তফসীর করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, যখন মুসলমানরা বদরের যুদ্ধের সময় মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে কতককে বন্দি করে, তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। হযরত উমর (রা.)-এর মতামত ছিল তাদেরকে হত্যা করা উচিত। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতামত ছিল তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়া উচিত। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শ পছন্দ করেন। আর এটি সূরা আনফালের ৬৮ নাম্বার আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে যে, কোন নবীর জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে পৃথিবীতে রক্তপাত করবে।

যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, এখানে যে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত ভিন্ন ছিল এবং হযরত উমর (রা.) এর মত ভিন্ন ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতামতকে পছন্দ করেন এবং ফিদিয়া নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেন। কিন্তু বলা হয় যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন যেন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এর এই কাজকে অপছন্দ করেছেন। বন্দিদের হত্যা করা উচিত ছিল এবং ফিদিয়া নেয়া ঠিক হয় নি। এটি তাবরীর তফসীরে রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, কিন্তু এই তফসীর সঠিক নয়। প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা সে সময় পর্যন্ত এমন কোন নির্দেশ অবতীর্ন করেননি যে, বন্দিদের কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে তাদেরকে যেন ছাড়া না হয়, তাই ফিদিয়া গ্রহণ করার কারণে মহানবী (সা.)-এর ওপর কোন আপত্তি আসতে পারে না। দ্বিতীয়ত এর পূর্বে মহানবী (সা.) নাখলা নামক স্থানে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'লা তাঁর (সা.) এই কাজকে অপছন্দ করেননি। তৃতীয়ত এটি থেকে মাত্র দুই আয়াত পরে আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের অনুমতি প্রদান করছেন যে, গনিমতের মাল থেকে তোমরা যা লাভ কর তা থেকে খাও, তা হালাল এবং পবিত্র। এ কথা কারো কল্পনাতেও আসতে পারে না যে, মহানবী (সা.)-এর ফিদিয়া গ্রহণ করাকে আল্লাহ তা'লা অপছন্দ করবেন আর এভাবে যে অর্থ অর্জিত হয় সেটিকে হালাল ও পবিত্র বলবেন। তাই এই তফসীরই ভুল আর সঠিক তফসীর এটিই যে, এই আয়াতে একটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, আর তা হলো, মানুষকে তখনই বন্দি করা যেতে পারে যখন রীতিমত যুদ্ধ হয় এবং কার্যকরী আক্রমণে শত্রুদের পরাজিত করা হয়। কুরআনের তফসীরকারকদের মধ্য থেকে আল্লামা ইমাম রাযী এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক আল্লামা শিবলী নু'মানী সাহেবেরও একই মতামত যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মদিনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) বন্দিদের বিষয়ে পরামর্শ করেন যে, তাদের সাথে কী করা উচিত। আরবে সাধারণত বন্দিদের হত্যা করার বা স্থায়ী দাস বানানোর রীতি ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রকৃতির জন্য এটি খুবই কষ্টকর ছিল আর তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন প্রকার ঐশী নির্দেশও অবতীর্ণ হয় নি। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন যে, আমার মতে তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, কেননা তারা মূলত আমাদেরই ভাই। হতে পারে আগামীতে এদেরই

মাঝে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের জন্ম হবে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) এ পরামর্শের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয় আর এরা তাদের কৃতকর্মের দরুন হত্যাযোগ্য হয়েছে। অতএব আমার মতে এদের সবাইকে হত্যা করা উচিত, বরং এ আদেশ দেয়া উচিত যে, মুসলমানরা নিজ হাতে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করবে। মহনবী (সা.) তাঁর প্রকৃতিগত দয়ার বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শ পছন্দ করেন এবং হত্যার বিপরীতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, যেসব মুশরিক নিজেদের ফিদিয়া ইত্যাদি প্রদান করে দিবে তাদেরকে যেন ছেড়ে দেয়া হয় অতএব পরবর্তীতে তদনুযায়ী ঐশী আদেশও অবতীর্ণ হয়। ফিদিয়া প্রদানের বিষয়ে যখন ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয়, যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও লিখেছেন, সেক্ষেত্রে উক্ত হাদীসকে মূল ভিত্তি বানিয়ে মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর ক্রন্দনের বিষয়টি অদ্ভুত। যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী এক হাজার দিরহাম থেকে শুরু করে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত তার ফিদিয়া নির্ধারণ করে দেয়া হয় আর এভাবে সকল বন্দি মুক্ত হয়ে যায়।

হযরত উমর (রা.)-এর মেয়ে হযরত হাফসা (রা.)-এর সাথে মহানবী (সা.)-এর বিবাহের বিষয়ে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো, হযরত হাফসার স্বামী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর অসুস্থ হয়ে মারা যান। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) হযরত হাফসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিষয়ে বুখারী শরীফে বিস্তারিত উল্লেখ আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হাফসা বিনতে উমর যখন খুনায়েস বিন হুযাফা সাহমীর (প্রয়ানে) বিধবা হন, যিনি মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি (রা.) মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন, তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি হযরত উসমান বিন আফফানের সাথে সাক্ষাৎ করি, তাঁকে হাফসার বিষয়ে অবগত করি এবং নিবেদন করি যে, আপনি চাইলে আপনার সাথে হাফসা বিনতে উমরের বিবাহ করিয়ে দিই। তিনি জবাবে বলেন, আপনার প্রস্তাবের বিষয়ে আমি চিন্তাভাবনা করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করি। কিছুদিন পর হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, আমি এখন বিবাহ করা সমীচীন মনে করছি না। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি হযরত আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বলি, আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে হাফসা বিনতে উমরের বিবাহ করিয়ে দিতে পারি। হযরত আবু বকর নীরব হয়ে যান এবং আমাকে কোন উত্তর দেন নি। হযরত উমর (রা.) বলেন, উসমানের তুলনায় তাকে (তথা আবু বকরকে) আমার অধিক অরাজি মনে হলো [অর্থাৎ মনে হলো, তিনি অধিক অস্বীকৃতি জানিয়েছেন]। এরপর আমি কিছুদিন অপেক্ষা করি। এরপর মহানবী (সা.)-এর সমীপে হযরত হাফসাকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রেরণ করি এবং অবশেষে তাঁর (সা.) সাথে হাফসার বিবাহ করিয়ে দিই। বিবাহ সমাপনান্তে হযরত আবু বকর আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নিবেদন করেন, সম্ভবত আপনি আমার পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়েছিলেন, অর্থাৎ আমি বিবাহের (প্রস্তাবে) অস্বীকৃতি জানানোর কারণে। অধিকন্তু আপনি যখন আমাকে হাফসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন আমি আপনাকে কোন উত্তর দেই নি। তখন আমি উত্তরে বললাম, জ্বী হ্যাঁ, আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। প্রকৃত বিষয় হলো, আপনি যখন বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন আমাকে উত্তর প্রদানে যে বিষয়টি বাধা দিয়েছিল তা হলো, মহানবী (সা.) হযরত হাফসাকে বিবাহের ব্যাপারে এমন কিছু বলেছিলেন- যে বিষয়টি আমি পূর্বেই অবগত ছিলাম আর মহানবী (সা.) এর উক্ত গোপন বিষয় আমি প্রকাশ করতে চাই নি। অর্থাৎ হযরত আবু বকরের (রা.) এ বিষয়টি জানা ছিল যে, মহানবী (সা.) হযরত

হাফসাকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, এই গোপনীয় বিষয় আমার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না কিন্তু, মহানবী (সা.) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আমি অবশ্যই তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতাম। এই ছিল হযরত আবু বকরের প্রত্যুত্তর। এই ঘটনার বিস্তারিত 'সীরাত খাতামান্নাবিঈন' পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ. (রা.)ও উল্লেখ করেছেন। তিনি (রা.) লিখেন,

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর একজন কন্যা ছিলেন যার নাম ছিল হাফসা। তিনি খুনায়েস বিন হুযাফার (রা.) সহধর্মিনী ছিলেন, যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পর খুনায়েস (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং উক্ত অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর কিয়দকাল পর হযরত উমর (রা.) হযরত হাফসার পুনরায় বিবাহের বিষয়ে চিন্তিতি হয়ে পড়েন। তখন হযরত হাফসা বিশোর্ধ ছিলেন। হযরত উমর (রা.) সাদা মনের মানুষ হিসেবে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করেন, আমার কন্যা হাফসা বর্তমানে বিধবা। আপনি চাইলে তাকে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এরপর হযরত উমর (রা.) একই প্রস্তাব হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থাপন করেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-ও কোন উত্তর না দিয়ে নীরবতা পালন করেন। এটি দেখে হযরত উমর (রা.) নিতান্তই কষ্ট পান এবং এই দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থাতেই তিনি মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! তুমি দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ্ চাইলে হাফসার ভাগ্যে আবু বকর ও উসমানের চাইতে উত্তম স্বামী জুটবে এবং উসমান হাফসার চাইতে উত্তম স্ত্রী পাবে। তিনি (সা.) এজন্যে একথা বলেছিলেন কারণ তিনি স্বয়ং হাফসার সাথে বিয়ে করার ও নিজ কন্যা উম্মে কুলসূমকে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে হযরত আবু বকর ও উসমান (রা.) দুজনই অবগত ছিলেন, যেকারণে তারা উভয়ই হযরত উমর (রা.)-এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে নিজ কন্যা হযরত উম্মে কুলসূমের বিয়ে করিয়ে দেন এবং এরপর নিজে হযরত উমরের নিকট তার মেয়ে হাফসার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেন। হযরত উমরের (রা.) এর চাইতে বেশি আর কী-ই বা চাওয়ার ছিল! তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান এবং হিজরী ৩ সনের শাবান মাসে হযরত হাফসা মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নবী পরিবারভুক্ত হয়ে যান। যখন এই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমরকে (রা.) বলেন, আপনি হয়ত আমার আচরণে (অর্থাৎ প্রস্তাব পেয়ে নীরব থাকার কারণে) কষ্ট পেয়েছেন। আসলে মহানবী (সা.)-এর স্বংকল্পের বিষয়ে আমি পূর্ব হতেই অবগত ছিলাম, কিন্তু তাঁর (সা.) অনুমতি ছাড়া এই গোপন বিষয়ের কথা আমি প্রকাশ করতে পারতাম না। তবে এটি ঠিক যে, মহানবী (সা.)-এর যদি এমনটি করার বিষয়ে সংকল্প না থাকত, তবে আমি সানন্দে হাফসাকে বিয়ে করতাম।

হাফসাকে বিবাহ করার একটি বিশেষ যৌক্তিকতা ছিল- তিনি হযরত উমর (রা.) এর কন্যা ছিলেন, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর শ্রেষ্ঠতর সাহাবী হিসেবে পরিগণ্য ও মহানবী (সা.)-এর বিশেষ নৈকট্যভাজন সাহবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ও হযরত খুনায়েস বিন হুযাফার অকালমৃত্যুতে হযরত উমর এবং হাফসা যে কষ্ট পেয়েছিলেন, সেই কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে হাফসাকে স্বয়ং বিয়ে করাকেই মহানবী (সা.) সমীচীন বলে মনে করেন। দ্বিতীয় যেই যুক্তিসঙ্গত কারণকে দৃষ্টিপটে রেখে তিনি এই বিয়ে করেন তা হলো তাঁর (সা.)-এর যত বেশি স্ত্রী থাকবেন, নারীদের মাঝে, যারা

মানবজাতির অর্ধেক বা কোথাও কোথাও অর্ধেকের চাইতেও অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান, ধর্মপ্রচার ও ধর্মশিক্ষার বিষয়টি আরও বৃহদাকারে এবং সহজ ও সুন্দর উপায়ে করা সম্ভব হবে।

হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে উহুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। উহুদের যুদ্ধের সময় যখন খালেদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ রচনা করে তখন মুসলমানরা সামলে উঠতে পারে নি। এর বিস্তারিত লিখতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন,

কুরায়েশদের সেনাদল প্রায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল এবং একের পর এক উপর্যুপরি আক্রমণে মুসলমানদের কোনঠাসা করে চলেছিল। হয়ত এরকম পরিস্থিতি থেকে মুসলমানরা কিছুক্ষণ পর সামলে উঠতে পারত, তবে বিপত্তি তখন বাঁধে যখন কুরায়েশদের এক বীর সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ বিন কামেয়া মুসলমানদের পতাকাবাহক মুসআব বিন উমায়েরকে আক্রমণ করে, যিনি পতাকা বহন করছিলেন। সে তরবারির আঘাতে তার ডান হাত কেটে ফেলে। মুসআব তৎক্ষণাৎ পতাকাটি অপর হাতে নিয়ে নেন এবং ইবনে কামেয়ার সাথে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হন। তখন সে দ্বিতীয় আঘাতে তার অপর হাতটিও কর্তন করে দেয়, যার ফলে মুসআব তার দুই কাটা হাত একত্র করে পতনমুখী পতাকাটি নিজের বুকের সাথে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। তখন ইবনে কামেয়া তৃতীয়বারের মতো আঘাত হানে, যার ফলে মুসআব শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পতাকাটি অন্য কোন মুসলিম সৈনিক এগিয়ে এসে ধরে ফেলেছিল, তবে যেহেতু মুসআব-এর দেহাবয়ব মহানবী (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই ইবনে কামেয়া ভাবল যে, আমি মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করেছি। আর এটিও হতে পারে যে, এই কাজ তার পক্ষ থেকে শুধুমাত্র ষড়যন্ত্রমূলক ও ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যাহোক সে মুসআব (রা.)-এর শহীদ হয়ে পড়ে যাওয়াতে হৈচৈ আরম্ভ করে যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট উদ্দ্যমও ভেঙে পড়ে এবং তাদের একতা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অনেক সাহাবী হতভম্ব হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। তখন মুসলমানরা তিনটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। এদের মাঝে একটি দল ছিল তারা, যারা মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ দলটি ছিল সবচেয়ে ছোট। কিন্তু যেমনটি কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে, তখনকার বিশেষ অবস্থা ও তাদের অভ্যন্তরীণ ঈমান ও নিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। দ্বিতীয় দলে তারা ছিলেন, যারা পালিয়ে না গেলেও মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে হয় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন অথবা সেই মুহূর্তে যুদ্ধ করাকে অর্থহীন মনে করতেন আর এজন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একদিকে সরে গিয়ে মাথা নীচু করে বসেছিলেন। তৃতীয় দল যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিলেন। এদের মাঝে কিছু লোক তারা ছিলেন, যারা মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে একত্রিত ছিলেন এবং আত্মবিলীনতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছিলেন। আর অধিকাংশ ছিলেন তারা, যারা বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছিলেন। এরা এবং দ্বিতীয় দলের লোকেরাও যখনই মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার সংবাদ পেতেন, তখনই উন্মাদের মতো লড়াই করতে করতে তাঁর (সা.) চতুর্পাশে একত্রিত হতেন।

যাহোক সে সময় অত্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ চলছিল এবং মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল। আর যেমনটি বলা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে অনেক সাহাবী নিরাশ হয়ে অস্ত্র ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন। এদের মাঝেই হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন যিনি হতাশ হয়ে একদিকে বসে পড়েছিলেন। এরা এভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রের একদিকে বসে ছিলেন; এমন সময়ে ওপর থেকে একজন সাহাবী হযরত আনাস বিন নাযার আনসারী (রা.) এসে পড়েন এবং তাদেরকে দেখে বলেন, তোমরা এখানে কী করছ? তারা উত্তর দেন, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন, এখন যুদ্ধ করে কী হবে! আনাস (রা.) বলেন,

এটাই তো যুদ্ধ করার সময়! যেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে মৃত্যু লাভ করেছেন, আমরাও তা লাভ করতে পারি। এছাড়া তাঁর (সা.) পর জীবনের কী-ই বা আনন্দ থাকে! তার সামনে হযরত সা'দ বিন মা'য (রা.) আসেন, তখন হযরত আনাস (রা.) বলেন, সা'দ! আমি তো পাহাড় থেকে জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি! এ কথা বলে আনাস (রা.) শত্রুদের সারিতে ঢুকে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর দেখা যায় তার শরীরে আশিটির অধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল আর কেউ চিনতে পারছিল না যে, এটি কার লাশ? শেষপর্যন্ত তার বোন তার আঙ্গুল দেখে তাকে শনাক্ত করেন।

উহুদের সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কতিপয় সাহাবীসহ পাহাড়ের একটি গিরিপথে পৌঁছতেই কাফেরদের একটি দল গিরিপথে আক্রমণ করে। এদের মাঝে খালেদ বিন ওয়ালীদও ছিল। মহানবী (সা.) তখন দোয়া করেন, **'আল্লাহুম্মা ইন্নাহু লা ইয়ামবাগী লাহুম আইয়া'লূনা'**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! এরা যেন আমাদের কাছে পৌঁছতে না পারে। এতে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) কয়েকজন মুহাজেরসহ উক্ত মুশরিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং মারতে মারতে তাদেরকে তাড়িয়ে দেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেন, আবু সুফিয়ান নিজের কয়েকজন সঙ্গীসহ সেই গিরিপথের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে মুসলমানরা একত্রিত ছিল। এর নিকটে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে বলে, হে মুসলমানেরা! তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) রয়েছে? আবু সুফিয়ান তার কিছু সঙ্গীকে সাথে নিয়ে সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয় যেখানে মুসলমানরা সমবেত ছিল এবং তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাক দিয়ে বলে, হে মুসলমানেরা তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) আছেন? মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কেউ উত্তর দিবে না। অতএব সব সাহাবী নীরব থাকেন। এরপর আবু সুফিয়ান আবু বকর ও উমর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু এবারও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কেউ উত্তর দেয় নি। এতে আবু সুফিয়ান দাম্ভিকতার ভঙ্গিতে বলে, এরা সবাই মারা গেছে, কেননা তারা জীবিত থাকলে অবশ্যই সাড়া দিত। তখন উমর (রা.) আর সহ্য করতে না পেরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠেন, হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা সবাই জীবিত আছি আর খোদা আমাদের হাতে তোমাদের লঞ্ছিত করবেন। আবু সুফিয়ান হযরত উমর (রা.)-এর কণ্ঠ বুঝতে পেরে বলেন, উমর! তুমি সত্য করে বল মুহাম্মদ (সা.) কি জীবিত আছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় তিনি জীবিত আছেন আর তোমার সব কথাই শুনছেন। আবু সুফিয়ান কিছুটা নীচু স্বরে বলে, তাহলে ইবনে কামেয়া মিথ্যা বলেছে। কেননা, আমি তোমাকে তার চেয়ে বেশি সত্যবাদী মনে করি। এরপর আবু সুফিয়ান খুবই উচ্চস্বরে হাঁক দিয়ে বলে, 'উ'লু হুবল'। অর্থাৎ হে হুবল! তোমার মর্যাদা উচ্চ হোক। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর পূর্বের নির্দেশের কারণে নিশ্চুপ ছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) যিনি নিজের নাম উচ্চারণের সময় নীরব থাকার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, এখন খোদা তা'লার বিপরীতে প্রতিমার নাম আসায় তিনি অস্থির হয়ে যান এবং বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবীগণ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা উত্তরে কী বলব? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা বল, **'আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল'** অর্থাৎ উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আর কেবল আল্লাহ্ তা'লারই। আবু সুফিয়ান বলে,'লানাল উয্যা, ওয়া লা উয্যা লাকুম'। অর্থাৎ আমাদের সাথে উয্যা আছে আর তোমাদের সাথে উয্যা নেই। মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, তোমরা বল, **'আল্লাহু মওলানা, ওয়া লা মওলা লাকুম'**। উয্যা কী জিনিস! আমাদের সাথে তো সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহ্ আছেন, পক্ষান্তরে তোমাদের সাথে কোন সাহায্যকারী নাই। এরপর আবু সুফিয়ান বলে, যুদ্ধ পানি উত্তোলনের বালতির ন্যায় হয়ে থাকে, যা কখনো ওঠে, কখনো নামে। তাই আজকের দিনটিকে তোমরা বদরের দিনের প্রতিশোধ মনে করো আর যুদ্ধের ময়দানে এমন লাশ তোমরা পাবে যাদের অঙ্গহানীও করা

হয়েছে। আমি এর নির্দেশ দেই নি, কিন্তু আমি যখন এ বিষয়টি জানতে পেরেছি তখন আমার লোকদের এহেন কাজ আমার কাছে খারাপও লাগে নি। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে পরবর্তী বছর এই দিনগুলোতেই বদরের ময়দানে পুনরায় যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। একজন সাহাবী এর উত্তরে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বলেন, খুব ভালো, এ প্রতিশ্রুতিই রইল। যাহোক, একথা বলে আবু সুফিয়ান নিজ সঙ্গীদের নিয়ে নীচে নামে এবং কুরায়েশ বাহিনী মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে।

মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের পর মদিনা পৌঁছেন তখন মুনাফেক এবং ইহুদিরা আনন্দ উল্লাস করতে থাকে এবং মুসলমানদের এটা সেটা বলতে থাকে আর বলতে থাকে যে, মুহম্মদ রাজত্ব চায় আর আজ পর্যন্ত কোন নবী এতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয় নি যতটা তিনি হয়েছেন; তিনি নিজেও আহত হয়েছেন আর সাহাবীরাও আহত হয়েছেন। তারা বলতে থাকে যে, যারা নিহত হয়েছে তারা যদি আমাদের সাথে থাকত তাহলে মারা পড়তো না। হযরত উমর মহানবী (সা.)-এর কাছে এসব মুনাফেককে হত্যা করার অনুমতি চান, কেননা তারা এমন কথা বলছিল। তিনি (সা.) বলেন, তারা কি এই সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই আর আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। এরা কলেমা তো পাঠ করে, নাকি? এতে হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, কেন নয়। এরা মৌখিক দাবি করে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে কপটতামূলক কথাও বলছে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) বলেন, এদের মৌখিক দাবি তরবারির ভয়ের কারণে। অতএব, এখন তাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাই, এখন যখন এদের মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে আর আল্লাহ্ এদের বিদ্বেষের বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন এজন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া উচিত। তাদেরকে শাস্তি দেয়া উচিত। তিনি (সা.) বলেন, যে এই সাক্ষ্য প্রদান করে তাকে হত্যা করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এই কলেমা পড়ে নেয় আমাকে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ অব্যহত থাকবে। এখন প্রয়াত কয়েকজনের স্মৃতিচারণ করতে হবে তাই এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

কিন্তু এর পূর্বে আমি দোয়ার আহ্বানও জানাতে চাই। আমি গত সপ্তাহেও অত্যাচারিত ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য দোয়া করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। যদিও যুদ্ধ থেমে গেছে, কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে যে, অল্পকাল বিরতি দিয়ে কোন না কোন স্থান থেকে, কোন না কোন পদ্ধতিতে কিংবা অজুহাতে শত্রুরা এই ফিলিস্তিনবাসীদেরকে অত্যাচারের শিকারে পরিণত করে এবং কোন না কোন উপলক্ষ্য সৃষ্টি হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর কৃপা করুন এবং ফিলিস্তিনবাসীরা যেন প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এমন নেতৃবৃন্দ দান করুন যাদের মাঝে বিবেক-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা রয়েছে আর যারা নিজেদের অধিকারের কথা বলতে এবং তা আদায় করতে সক্ষম। একইভাবে যেসব আহমদী অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন তাদের জন্যও দোয়া করুন, বিশেষভাবে পাকিস্তান। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন।

আজ আমি যেসব মরহুমের জানাযা আদায় করব তাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন, কাদিয়ানের নায়েব নাযের ইশায়াত কুরায়শী মুহাম্মদ ফযলুল্লাহ্ সাহেব যিনি গত ২৭ এপ্রিল তারিখে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার মায়ের দাদা এবং পিতার নানা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুনশী মেহের দীন (রা.)-এর মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে এবং তাঁর নাম মিনারাতুল মসীহ্‌র চাঁদা দাতাদের তালিকাতেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

জামেয়া আহমদীয়া থেকে পড়ালেখা শেষ করার পর কুরায়শী সাহেব ২৩ বছর ৫ মাস জামেয়াতে শিক্ষকতা করেন এবং সেখানে কুরআন মজীদ, উর্দু, কালাম, সারফ্ নাহভ্, আরবী

সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় পড়ান। তার মোট সেবাকাল হলো ৩৭ বছর ৭ মাস। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তার স্ত্রী, এক পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন।

তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কাদিয়ানের নাযের ইশায়াত মাখদুম সাহেব লিখেন, জামেয়াতে তিনি একজন স্নেহভাজন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সাথে অনেক ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। একান্ত ঈমানদারীর সাথে এবং ওয়াকফের প্রকৃত প্রেরণা নিয়ে সর্বদা কাজ করতেন। ছাত্রদের সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দিতেন ও পালন করাতেন। ভারতের অধিকাংশ মুবাল্লেগ তার ছাত্র এবং তার কাছ থেকেই কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। তার প্রকৃতিতে সরলতা বিদ্যমান ছিল। খুবই স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন, বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ কথা বলতেন। তিনি ভারতের খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর হিসেবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্যও পেয়েছিলেন। ৩৪ বছরের একটি লম্বা সময় যাবৎ তিনি বদর পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। মিশকাত-এরও সম্পাদক ছিলেন। 'ভারতে আহমদীয়াতের ইতিহাস' কমিটির সদস্যও ছিলেন। রূহানী খাযায়েনের কম্পিউটারাইজড এডিশনের প্রুফ রিডিং করতে গিয়ে তিনি কিছু ভুল বের করেছিলেন যা পরবর্তীতে তার বলার পরে সংশোধন করা হয়েছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখতেন এবং প্রুফ রিডিং করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু পুস্তক যা পৃথক আকারে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর সম্পূর্ণ প্রুফ রিডিং করেন, বিশেষত বারাহীনে আহমদীয়া, আরিয়া ধরম, সাত বচন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব পুস্তকে যেসব রেফারেন্স ব্যবহার করেছেন তা তিনি মূল উৎস থেকে অর্থাৎ গ্রন্থ এবং বেদ থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সমীক্ষা চালিয়ে একেকটি শব্দের উচ্চারণ ও অনুবাদে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো তা নোট করতেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি নিজের গবেষণাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত ছিলেন। আরিয়া ধরম এবং সাত বচন পুস্তকের উদ্ধৃতিগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো যাচাই ও সমীক্ষাকরণের কাজটি তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে করেছিলেন। তিনি বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক দু'টি হিন্দু ও শিখদের জন্য দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে আর এ দু'টি পুস্তকই এই দুই ধর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। তাই এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চেক করতে হবে এবং উদ্ধৃতিসমূহ সঠিক করতে হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে নতুন 'খাত্তে মনযূর' ফন্টে যে কুরআন করীম প্রকাশিত হয়েছে সেটির সফটওয়্যার তৈরিতেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। এটি মুম্বাইয়ের একটি কোম্পানির কাছ থেকে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। তিনি এর সংশোধন এবং এটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে রাত দিন পরিশ্রম করেছেন। মনজুর ফন্টে কুরআন শরীফ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর তিনি মৌলভী শের আলী সাহেবের ইংরেজি তরজমা কুরআন সংশোধন এবং পরিমার্জনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যার কাজ প্রায় শেষ আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে। এছাড়া মৌলভী ইসহাক সাহেবের কুরআন অনুবাদের কয়েক পারাও তিনি সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। পবিত্র কুরআনের সেবায় তিনি পরিশ্রমের সাথে অনেক কাজ করেছেন। বিশেষভাবে মনজুর ফন্টে কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

নাযের ইশায়াত সাহেব লিখেছেন, মরহুম আমার শিক্ষক এবং মামা শশুর ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমার সহকারী হিসেবে আমার পূর্ণ আনুগত্য করেছেন। তিনি অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। কখনো বলেন নি, আমি তোমার শিক্ষক কিংবা সম্পর্কে তোমার চেয়ে বড়। মরহুমের ছাত্রদের মধ্যে কেউ লিখেছেন, ক্লাসে তিনি বলতেন যে, জামেয়াতে শিক্ষা

জীবনে তিনি কখনো ছুটি নেননি। এরপর তার শিক্ষক জীবনেও যখন তিনি জামেয়াতে পড়াতেন, কখনো ছুটি নেননি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ সৈয়দ বশীর উদ্দিন আহমদ সাহেবের, যিনি জামা'তের মুরব্বী এবং কাদিয়ানের বাসিন্দা ছিলেন। ৮৩ বছর বয়সে তিনি ঐশী তকদীরের অধীনে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত সৈয়দ সাঈদ উদ্দিন সাহেব (রা.)-এর নাতি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুযার, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়াগো, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে রেখে গেছেন। তিন ছেলেই আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ বাশারত আহমদ হায়দার সাহেবের, যিনি কাদিয়ানের একজন ওয়াকফে জিন্দেগী এবং ফয়েয আহমদ শানা সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত আব্দুল করীম সাহেব (রা.), যার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কুকুরের কামড় সংক্রান্ত নিদর্শন ছিল, তার নাতি ছিলেন। তিনি জীবন উৎসর্গ করে কর্ণাটক থেকে কাদিয়ানে আসেন। এরপর মাদ্রাসাতুল আহমদীয়ায় শিক্ষাজীবন শেষ করে বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেন। এরপর তিনি রিশতানাতা বিভাগের ইনচার্জ নিযুক্ত হন। তিনি ৪৬ বছর জামা'তের সেবা করেছেন। আয় কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ছিমছাম ও সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন। অত্যন্ত চরিত্রবান ও দয়ালু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ওসীয়্যতকারীও ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে মরহুম তিন মেয়ে রেখে গেছেন, যাদের তিনি উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন এবং সবার বিয়ে ওয়াকফে জিন্দেগীদের সাথে দিয়েছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মোকাররম ডাক্তার মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের, যিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পেশাওয়ারের জেলা-আমীর ছিলেন। তিনি গত মাসে ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ইন্টারমেডিয়েটের ছাত্র থাকাকালীন নিজেই বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমি আমার চাচার দোকানে বসা ছিলাম। সেখানে একজন সম্মানিত ব্যক্তি আসেন। তার চলে যাওয়ার পর আমার চাচা বলল যে, তুমি জান এই ব্যক্তি কাদিয়ানী! আর কাদিয়ানীরা অনেক ভালো মানুষ হয়ে থাকে। এভাবে সর্বপ্রথম আমি জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারি। এরপর মেডিকেল কলেজে তার একজন সহপাঠী আহমদী ছিল। তিনি তাকে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কী, জীবিত নাকি মৃত তা জিজ্ঞেস করেন। ডা. মুহাম্মদ আলী সাহেব বলেন, আমি তো তাকে মৃত মানি। একথা শুনে আহমদী সেই ছাত্র চিন্তা করে, তাহলে তাকে তবলীগ করা উচিত। যাহোক এরপর তিনি তাকে মিশন হাউজে নিয়ে যান, সেখানে তাকে জামা'ত সম্পর্কে অবগত করেন। সেখানে তখন বাশারত বশীর সিদ্ধি সাহেব মুরব্বী ছিলেন। তাকে প্যান্টশার্ট পড়া অবস্থায় দেখে তিনি প্রভাবিত হন আর (মনে মনে বলেন,) মৌলভী হলেও বেশ আধুনিক মৌলভী। যাহোক, তিনি অর্থাৎ বাশারত সাহেব তাকে 'দাওয়াতুল আমীর' পুস্তক পড়তে দেন। তিনি বলেন, আমি তা পাঠ করি আর সেদিনই তা পড়ে শেষ করি। এর ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আহমদীয়াত সত্য। ১৯৭৩ সনে তিনি বয়আত করেন এবং ১৯৭৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার বয়আত মঞ্জুর করেন। ১৯৭৪ সনে তার আহমদী হওয়ার পরপরই বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যও শুরু হয়ে যায়। তখন তার কলেজের ছেলেরা দল বেধে তাকে পাকড়াও করে বলে, আহমদীয়াত ত্যাগ কর, (তারা জেনে গিয়েছিল যে, তিনি আহমদী) অন্যথায় তোমাকে আমরা শহীদ করে ফেলব, অর্থাৎ হত্যা করব। যাহোক কলেজের ব্যবস্থাপনা তখন কিছু করতে পারে নি। সেই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছিলেন বাচা

খানের ছেলে আলী খান। তিনি সেখানে এসে তাকে তাদের কাছে থেকে মুক্ত করে নিজের সাথে নিয়ে যান এবং নিজের গাড়িতে করে শহরের বাহিরে নিয়ে রেখে আসেন। তিনি বলেন, সেখান থেকে আমি খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে আমার গ্রামে যাই। এ অবস্থা দেখে তার পিতা তাকে বলেন, তুমি নিজেই নিজেকে কষ্টে নিপতিত করছ আর আমাদেরও দুর্নাম করছ। তুমি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করছ না কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আহমদীয়াত ছাড়তে পারব না। যাহোক তিনি বলেন, পিতার সাথে আমার ধর্ম নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে আর অবস্থার অবনতির কারণে পড়াশোনাও চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয় নি। খুবই খারাপ অবস্থা ছিল, কিন্তু তিনি আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। একদিন তার পিতা বলেন, এ সমস্যার ইতি টান আর আহমদীয়াত ছেড়ে দাও। একথা শুনে তিনি বলেন, এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমার কাছে একটিই উপায় রয়েছে আর তা হলো আমাকে খাবার পাঠানোর সময় তাতে বিষ মিশিয়ে দিবেন যাতে আমি মারা যাই আর আপনার সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়, কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তকে আমি ছাড়তে পারব না। এরপর তার পিতা তাকে আর কখনোই আহমদীয়াত ছাড়তে বলেন নি। তার পিতা মৃত্যুবরণ করলে তিনি তাকে দেখতে যান, কিন্তু জানাযার নামায পড়েন নি। মানুষ বলে, এটি গোত্রীয় রীতিনীতির ঘোর বিরোধী এবং অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করে বলে, কেমন সন্তান! নিজ পিতার জানাযা পর্যন্ত পড়ে নি। এর উত্তরে তিনি বলেন, আমার কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি আর বাকি সব এরপর। অনুরূপভাবে তার মা-ও তার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, তুমি আমার ছেলে নও আর এরপর তাকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেন। এরপর তিনি আর তার গ্রামে যান নি, কিন্তু মাকে সাহায্য করতেন। তার বড় চাচার বাড়ি যেতেন, সেখান থেকে মায়ের খোঁজখবর রাখতেন আর তাকে আর্থিক সাহায্যও করতেন। তিনিও যখন মারা যান তখন তার জানাযাও তিনি পড়েন নি। অনুরূপভাবে তিনি তার এক ছোট ভাইকেও আহমদী বানিয়েছিলেন, তিনিও জানাযা পড়েন নি। এরপর এ বিষয়েও মানুষ আপত্তি করে বলে যে, কেমন ছেলে! তখনও তিনি একথাই বলেন যে, এটি জামা'তের মর্যাদার বিষয়, তারা যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালাগালি করতেন, তাই আমরা (তাদের) জানাযা পড়তে পারি না। তিনি অসধারণ আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন। তিনি ২৭ বছর সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেন এবং ল্যাফটেনেন্ট কর্নেল পদে থাক অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন। অবসর গ্রহণের সময় তিনি রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র সেনা পদকে ভূষিত হন। এরপর তিনি পেশওয়ারের নাসীর টিচিং হাসপাতালে সহকারী প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে থাকেন এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানও ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে ৩২ বছর বয়সে সীমান্ত এবং পেশওয়ার জামা'তের আমীর নিযুক্ত করেন। ১৯৮৫ সনে তাকে ওয়াকফে জাদীদের বোর্ড অব ডাইরেক্টর নিযুক্ত করেন। তিনি আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ওয়াকফে জাদীদের বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সদস্য ছিলেন। অনুরূপভাবে ফযলে উমর ফাউন্ডেশন, তাহের ফাউন্ডেশ এবং স্টেন্ডিং শূরার সদস্য ছিলেন। তার ছোট ভাই কর্ণেল আইয়ূব সাহেব, যার কথা আমি উল্লেখ করেছি, তিনিও আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক আমীর শামসুদ্দীন খান সাহেবের কন্যার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। ছেলে ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত এবং বর্তমানে তানজানিয়ায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের ব্যবস্থাপনার অধীনে দায়িত্ব পালন করছে। তিনি লিখেন, ডা. মুহাম্মদ আলী খান সাহেব সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিঃস্বার্থতা ও বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখতেন। কখনোই ধনসম্পত্তি, টাকা-পয়সা, পার্থিব সম্পদ বা অন্য কোন জিনিসের কথা বলতেন না (তার প্রত্যেক সন্তানই একথা লিখেছে) আর সর্বদা অত্যন্ত প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট

চিত্তে জীবন অতিবাহিত করেছেন। সর্বাবস্থায়, বিশেষত পেশোয়ারে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের ওপর আস্থা রেখে পেশোয়ার জামা'তের নেতৃত্ব দিয়েছেন। পেশোয়ারের মানুষ তার মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও আদর্শস্থানীয় ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা, মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রেম এবং আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, এমন অগণিত গুণাবলীর অধিকারী এক ব্যক্তি ছিলেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো রাবওয়ার জনাব মুহাম্মদ রাফী খান শাহজাদা সাহেবের; গত ৩০ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত গোলাম রসূল আফগান সাহেব ও আয়েশা পাঠানী সাহেবা (রা.)-এর দৌহিত্র এবং হযরত আব্দুস্ সাত্তার খান সাহেব ওরফে বুযূর্গ সাহেবের প্রদৌহিত্র ছিলেন। তিনি ইবাদতে একনিষ্ঠ ছিলেন এবং যুবক বয়স থেকেই তাহাজ্জুদ পড়তেন। ধর্মের জন্য অত্যন্ত আত্মাভিমান ও গভীর আবেগ রাখতেন, অত্যন্ত পবিত্রচেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। শেষ অসুস্থতার সময়ও হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট সত্ত্বেও উচ্চঃস্বরে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। একসময় তিনি আবুধাবি চলে গিয়েছিলেন। তিনি আবুধাবিতে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন, সেখানে বিমান বাহিনীর এসেম্বলীতে কোন মৌলভী বলে বসে, কাদিয়ানীরা 'ওয়াজেবুল-কতল' (হত্যাযোগ্য)। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি আহমদী, আমাকে হত্যা কর!' যাহোক, এরপর পদত্যাগ করে সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন। এখানে এসে নিজের মেডিকেল স্টোর খুলেন এবং এই সময়কালে রাজেকীর পশ্চিম দারুর রহমত মহল্লার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও পালন করেন। একইসাথে এমটিএ-র অনুষ্ঠান 'পশতু মুযাকেরা' (পশতু আলাপন)-এরও প্রায় ৫০টি পর্বে অংশগ্রহণ করেন। পাড়ার প্রতিটি ব্যক্তির সাথে তার অত্যন্ত স্নেহার্দ ও পিতৃসুলভ আচরণ ছিল। লোকজনকে গোপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই ছেলে ও চার মেয়ে রেখে গিয়েছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো অস্ট্রেলিয়ার আইয়্যায ইউনুস সাহেবের, ২৪ মার্চ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেটে বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ায় তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ একজন যুবক ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বলে রেখেছিলেন, আপনার যে কাজেই প্রয়োজন হয় আমাকে নির্দেশ দেবেন, আমি চলে আসব। সর্বদা সেবার জন্য উপস্থিত থাকতেন এবং সবাইকে বলে রেখেছিলেন যে, আমার ঘরের দরজা খোলা আছে, যখনই সাহায্যের প্রয়োজন চলে আসবেন। সবাইকে অনেক বেশি সাহায্য সহায়তা করতেন। যাহোক, তিনি যুবক ছিলেন, এখনও বিয়ে হয় নি, সরকার তার মৃত্যুতে তার পিতামাতাকে পাকিস্তান থেকে আসার জন্য ভিসাও দিয়েছে এবং সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মিয়া কুরবান হোসেন সাহেবের পুত্র মিয়া তাহের আহমদ সাহেবের। তিনি রাবওয়ার ওকালতে মাল সালেসের সাবেক কর্মী ছিলেন। তিনি আমাদের এখানে ইসলামাবাদ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস আহমদ সাহেবের পিতা। তিনি ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। স্থানীয় জামা'তে তিনি সেক্রেটারী তরবিয়ত ছিলেন। তিনি আনসারুল্লাহ্‌র নায়েব সদর এবং যয়ীম হিসেবে সেবাদান করেছেন। তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদ এবং নফল নামায পড়তেন, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি একজন

ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার অবর্তমানে তিনি স্ত্রী ছাড়া দুই মেয়ে এবং তিন ছেলে রেখে গিয়েছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ যুক্তরাজ্যের ফারুক আফতাব সাহেবের পিতা রফিক আফতাব সাহেবের। তিনিও গত এপ্রিল মাসে ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ফারুক সাহেব লিখেন, আমার পিতা বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী, নম্র স্বভাবের, সদালাপি, প্রফুল্ল প্রকৃতির, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অতিথিপরায়ণ একজন মানুষ। এছাড়া অনেকেই আমার কাছে ফোনে তার এসব গুণাবলীর সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সন্তানসন্ততিকেও তিনি সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করতেন আর এর ফলস্বরূপ সন্তানরা আজ জামা'তের সেবাও করে যাচ্ছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের শিক্ষক জনাব মির্যা নাসির আহমদ চিট্টি মসীহ্ সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া জেরিনা আক্তার সাহেবার। তিনি গত মাসে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনিও সাহাবীর বংশধর ছিলেন আর অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলা ও কৃতজ্ঞ মহিলা ছিলেন। তিনি তার পিতামাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি সবার উত্তমরূপে সেবা করেছেন। ওয়াকেফে জিন্দেগী স্বামীর সাথে বিশ্বস্ততা ও স্বল্পতুষ্টির জীবন কাটিয়েছেন। ঘানায় তিনি ভীষণ অর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও অগাধ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞচিত্তে সন্তানদের নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন, কখনো টু শব্দটিও করেন নি। মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তার এক পুত্র মির্যা তৌকির আহমদ ওয়াকেফে জিন্দেগী হিসেবে এম.টি.এ.-তে কর্মরত আছেন।

পরবর্তী জানাযা জনাব হাফিয মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের। চলতি মাসে তিনি তাহের হার্ট ইন্সিটিটিউটে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাদের পরিবারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে। এরপর তার দাদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর হাতে হাত রেখে বয়আত করতে না পারলেও লিখিত বয়আত করেছিলেন। তার এক দৌহিত্র আব্দুল খবীর রিযওয়ান এখানে যুক্তরাজ্যে পি.এস. দপ্তরে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নিজেও জামা'তের সেবায় নিজেকে উপস্থাপন করেন আর সত্যায়নের জন্য ফয়সালাবাদের সাবেক আমীর মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেবের কাছে গেলে তিনি তাকে বলেন, আপনি ধর্মসেবা করতে চাইলে এখানে আমার কাছে থেকে ধর্মসেবা করুন। অতঃপর তিনি তার সারাটি জীবন ফয়সালাবাদ জামা'তের একজন কর্মী হিসেবে কাটিয়েছেন এবং সবসময় ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজেকে তিনি একজন জীবন উৎসর্গকারী মনে করতেন। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন এবং তার জীবদ্দশাতেই নিজের হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করে দিয়েছেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, যা কখনো বাদ যেত না। ফয়সালাবাদে তিনি অনেক শিশু-কিশোরকে পবিত্র কুরআন পড়ানোর এবং কুরআন মুখস্থ করানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নিজের ছোট ছেলেকেও তিনি কুরআন শরীফ হিফয করিয়েছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মোহতরম চৌধুরী নূর আহমদ নাসের সাহেবের, যিনি ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ চৌধুরী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার দুই পুত্র ওয়াকফে জিন্দেগী। একজন হলেন মনসূর আহমদ নাসের, যিনি আমাদের লাইবেরিয়া জামা'তে স্কুলের প্রিন্সিপাল আর অন্যজন হলেন মাসরূর আহমদ মুযাফ্ফর সাহেব, তিনি ঘানায় মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছেন। এ দুজন ছেলেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। মরহুম একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন।

পরবর্তী জানাযা হাকীম উবায়দুল্লাহ্ মিনহাস সাহেবের পুত্র জনাব মাহমুদ আহমদ মিনহাস সাহেবের। তিনি গত মাসে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার এক পুত্র রাশেদ মাহমুদ মিনহাস সাহেব মুবাল্লেগ। তিনি বলেন, মরহুম একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ এবং বহু গুণের আধার ছিলেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। খিলাফতের প্রেমিক এবং দরিদ্র-অসহায়দের সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তার এই পুত্রও ঘানায় কর্মরত থাকার কারণে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। অনুরূপভাবে আরেক পুত্র মালয়েশিয়াতে অবস্থান করার কারণে জানাযায় অংশ নিতে পারে নি।

আল্লাহ্ তা'লা উক্ত সবাইকে, অর্থাৎ এসব মরহুমের সন্তানসন্ততি এবং আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য্য ও মনোবল দান করুন আর সকল মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। জুমুআর নামাযের পর আমি তাদের জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)